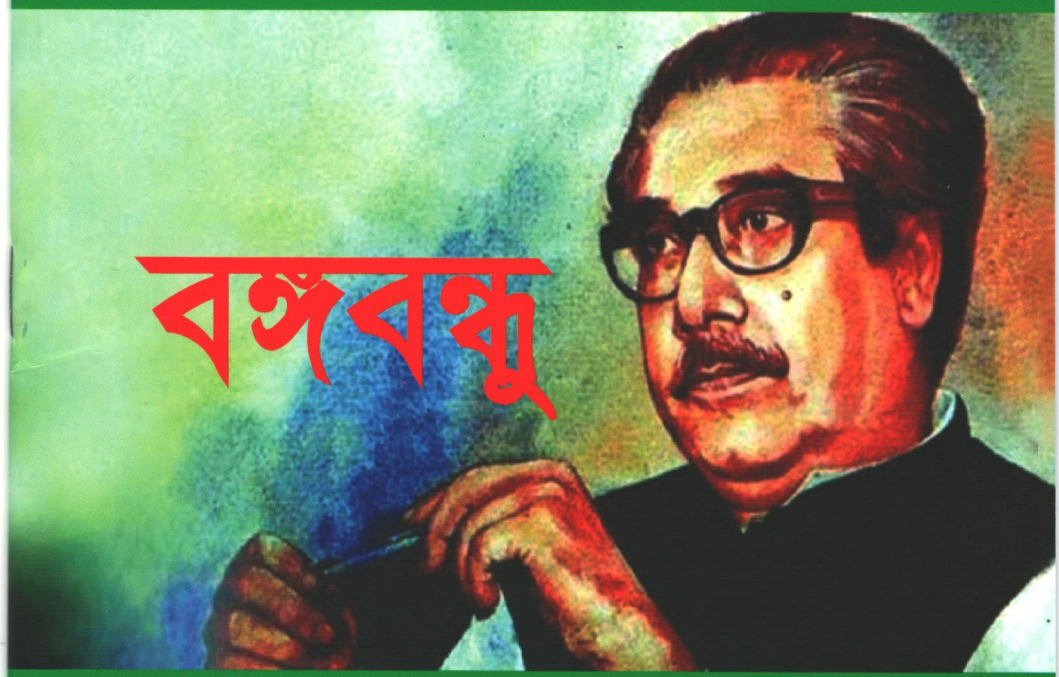

বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

পালক পাবলিশার্স

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, *বিএ অনার্স; এম এ*
স্বত্বাধিকারী - পালক পাবলিশার্স
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৪১০৭০৭৭৬, ০১৬৮০০৭৬৯৮৯, ০১৫৬৮৫২৭৭০৯
ই-মেইল : palokpublishers2011@gmail.com
f : Palok Publisher f group : Palok Publishers
Online Sale : https://www.rokomari.com/book/publisher/217/palok-publishers

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৮
মার্চ ২০২২

প্রচ্ছদ
প্রচ্ছদের ছবি সংগৃহীত

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য : চল্লিশ টাকা

ISBN 978 984 8143 86 5

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা। তিনি ধাপে ধাপে ছাত্রনেতা থেকে বাঙালির একান্ত আপনজন ও অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন। বাঙালি জনতাকে এক ছাতার নিচে এনে অধিকার-স্বাধিকার আন্দোলনকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ দেন। ১৯৭১-এর ৭ মার্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার কৌশলী দিক-নির্দেশনা দেন এবং বাংলার মানুষকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে আহ্বান জানান। তিনি অবশ্যই জানতেন পাকিস্তানি হায়েনারা আঘাত হানবে। তারই ইঙ্গিত দিতে এবং তা প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীকে তৈরি হওয়ার আহ্বান জানাতে তিনি এরকম বক্তব্য দেন এবং আরো বলেন যে, তিনি যদি হুকুম নাও দিতে পারেন, রাস্তা-ঘাট যা যা আছে সব কিছু যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ দেশকে শত্রুমুক্ত করতে যা যা প্রয়োজন তাই করতে হবে।

মার্চের ২৫ তারিখ নিরিহ বাঙালির উপর পাকিস্তানি পৈশাচিক আক্রমণ শুরু হওয়ার পর ২৬ তারিখের অতি ভোরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপরই দখলদারদের তাড়াতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ২৬৫ দিনের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়।

এই পুস্তিকাতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের উপযোগী কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পুস্তিকাটি পড়ে উদ্দীষ্টরা ছাড়াও অন্যরা উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বইয়ের লেখক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনকে আমি অভিনন্দন জানাই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য। পালক পাবলিশার্সকে ধন্যবাদ এই পুস্তিকাটি প্রকাশ এবং এটির বহুল বিতরণের ব্যবস্থা করার জন্য।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, কিউ কে আহমদ ফাউন্ডেশন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধ তৈরিতে সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রদ্ধেয় ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ, যিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, অর্থনীতিবিদ, সমাজচিন্তক, মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 'একুশে পদক' প্রাপ্ত। বর্তমানে তিনি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং ভারতের মর্যাদাপূর্ণ 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারে ভূষিত বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীককে যিনি অসামান্য ধৈর্যের সাথে প্রবন্ধটি সম্পাদনা করেছেন। পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পালক পাবলিশার্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পুস্তিকায় যা লেখা হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব লেখকের নিজের।

মোঃ জসীম উদ্দিন

বঙ্গবন্ধু ঃ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক ব্যতিক্রম শিশুর জন্ম হয়। এই শিশুই পরবর্তীতে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামে জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। তাঁদের পূর্বপুরুষ মোগল আমলে ইরাকের বাগদাদ থেকে বাংলায় আগমন করেন। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, দুর্বল কৃষকের প্রতি জমিদারদের রক্তচক্ষু, অন্যায়ভাবে তাদের প্রতি জুলুম ছিল তাঁর চির চেনা এবং অসহনীয়। যার ফলে শৈশবকাল থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হিসেবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই। ক্লাস এইটে পড়ুয়া মুজিবের সাক্ষাৎ ঘটে বাংলার বাঘ এবং অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে। সে সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীই অনুধাবন করেন যে, এই ছেলেই একদিন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একটি জনসভা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কর্তৃক ভণ্ডুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করায় মহকুমা প্রশাসক স্কুল জীবনেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে এবং সপ্তাহখানেক জেলে রাখে। ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সেই তিনি তাঁর চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেছা রেণুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে ২২ বছর বয়সে শেখ মুজিব ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন।

২

১৯৪২ সালে তিনি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে কলকাতা যান এবং ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) ভর্তি হন। তাঁর অবস্থান হয় ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলে। কলকাতা যাওয়ার পরই তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ

সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হন এবং জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত হন। তখন একদিকে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, অপরদিকে অবিভক্ত ভারতবর্ষে চলছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে আন্দোলনে শরিক হন শেখ মুজিব। ১৯৪৩ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের উত্তাল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুর্বিষহ দিনগুলোর অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক, বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা ধারণ করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হয় এবং একই বছরে তিনি ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

৩

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো কিন্তু বাঙালির প্রতি বৈষম্য, শোষণ, শাসন ও বঞ্চনা রয়ে গেল ঠিক আগের মতোই। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি এলো না বাঙালিদের জীবনে। এমতাবস্থায় তিনি শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শুরু করলেন আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আঘাত আসে ভাষার উপরে। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে 'বাংলাভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়। এই দাবি দিবসকে সফল এবং আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে খুলনা দৌলতপুরসহ বরিশাল ঘুরে ছাত্র সমাবেশ করেছিলেন। ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব ১১ মার্চের বাংলাভাষা দাবি দিবসকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১১ মার্চ ছাত্রদের উপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হলো। ১৯৪৮ এর ১১ মার্চ সকাল ১০টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন জিন্নাহসহ মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ভাষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোনো প্রশ্নেই বাংলার জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিবে না। তিনি মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে মাতৃভাষা বাংলাসহ অন্যান্য অধিকারের দাবিতে মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। ক্রমবর্ধমান ভাষা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সরকারের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ভাষণদান

কালে তিনি বলেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" ২৪ মার্চ মি. জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পুনরায় "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা করলে উপস্থিত ছাত্ররা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সেদিন শেখ মুজিবই সকলের আগে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। কার্জন হলের ঘটনায় মি. জিন্নাহ অপমানিত বোধ করে কার্জন হল ত্যাগ করেন।

ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে সমর্থন ও নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে তাঁকে জরিমানা করা হয়। এই অযৌক্তিক আদেশ না মানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে।

৪

১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধু আবার গ্রেফতার হন। তিনি ৮০ দিন কারাভোগ করে ২৮ জুন মুক্তি পান। এই বছরই মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বাঙালি ও বাংলার স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলির "রোজ গার্ডেন" প্যালেসে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ও সামসুল হক এই রাজনৈতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকলেও এই দলের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন।

৫

আন্দোলন সংগ্রামের সপক্ষে মিছিল মিটিং প্রতিবাদ সমাবেশ করে ছাত্র জনতাকে উসকে দেয়ার অপরাধে ১৯৪৯ সালের ২৫ অক্টোবর হতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেলে রাখে। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং নিরাপত্তা আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি হিসেবে আটক রাখা হয়। এই সময় দুই বছর এক মাস ছাব্বিশ দিন তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। ১৯৫২ সালের ২৬[১] ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকেই তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং জেলে অনশন শুরু করলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ঢাকা কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করে। তিনি ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর কারাগারে পৌঁছান। বিনা বিচারে বন্দি রাখার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন এবং একটানা ১১ দিন অনশনে থাকার পর পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিতে। বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা করা হোক এই দাবিতে ১৯৫২ সালের মে মাসে তিনি একাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মুখোমুখি হন এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের হত্যার বিচার ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানান।

এদিকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা"র দাবিতে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে গুলি চালানো হয় এবং ভাষার দাবিতে পৃথিবীতে রক্ত দেয়ার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করে। ছাত্র-জনতার কাতারে থেকে দেশব্যাপী নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তিনি।

৬

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সরকার ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ৫ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা প্রকাশিত হয়। এই ২১ দফার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল হারিকেন।

৭

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন এবং গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জমান ঠাণ্ডা মিয়াকে ১০ হাজার ভোটে পরাজিত করে প্রাদেশিক আইনসভার এমএলএ নির্বাচিত হন। এ কে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় বন এবং কৃষি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

মন্ত্রিসভা যখন পূর্ণ উদ্যমে তাঁদের কর্মকাণ্ড শুরু করে সেই সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নারায়ণগঞ্জে আদমজি জুট মিল ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলি পেপার মিলে অর্থ খরচ করে প্রচন্ড দাঙ্গা শুরু করে দেয়। এই দাঙ্গায় প্রায় ১,০০০ জন মানুষ নিহত হন। সেই সময় ১৯৫৪ সালের ৩০[২] মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দাঙ্গার মাধ্যমে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি এবং দেশদ্রোহের অভিযোগে এ কে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে '৯২-ক' ধারা জারি করেন এবং পুরো বাংলাতে গভর্নরের শাসন আরোপ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের ২৩[৩] ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

৮

১৯৫৫ সালের ৫ জুন অনুষ্ঠিত গণপরিষদ নির্বাচনে শেখ মুজিব বিপুল ভোটে জয়লাভ করে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের সংবিধান পাস হয়, যা ১৯৫৬ সালের ৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভার শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

৯

১৯৫৭ সালের ৮-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার 'কাগমারী' নামক স্থানে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই ভাসানীর সাথে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। এই সময়েই আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী শেখ মুজিবকে মন্ত্রিত্ব বা দলের সাধারণ সম্পাদক পদের যে-কোনো একটি পদ বেছে নেয়ার কথা জানানো হয়। তিনি দলকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ বেছে নেন। ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে মওলানা ভাসানী পদত্যাগ করেন। ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ।

১০

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। জেনারেল আইয়ুব খান প্রথমে সামরিক প্রশাসক ও পরবর্তীতে (২৭ অক্টোবর) নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব গ্রেফতার হন এবং ৬ বছরের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়। আইয়ুব খানের কলঙ্কিত স্বৈরশাসনে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে বাংলার মানুষ। ১৯৬০ সালে জনগণের ভোটাধিকার খর্ব করে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

আপোষহীন নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেওয়া শুরু হয়। তিনি ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর গ্রেফতার হন এবং ১৪ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় জেল গেটে গ্রেফতার হন। অত্যাচার, দমন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের দুঃশাসন কায়েম করা হয় এই বাংলায়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পুনরায় গ্রেফতার হন।

১১

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান শিক্ষা সংকোচনের নীতি জারি করলে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের সূচনা করে। আইয়ুব খান সামরিক শাসন তুলে নেন এবং ১৮ জুন শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন। এই বছরের সেপ্টেম্বরে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এটাই ইতিহাসে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন নামে অক্ষয় হয়ে আছে। ২৮ অক্টোবর মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন। আন্দোলন চলাকালীন ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর অসুস্থ অবস্থায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে শেখ মুজিবুর রহমান ভেঙে পড়লেও শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নতুনভাবে আপোষহীন রাজনীতি শুরু করেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শিক্ষার্থীদের গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন এবং ১৯৬৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর' বক্তব্য দেয়ার জন্য বন্দি করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

১২

১৯৬৫ সালে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যা ১৭ দিন স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধের পর পরই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পারেন পাকিস্তানিরা বাঙালিদের স্বার্থ দেখবে না। বাঙালিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না।

১৩

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের এক সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ঐতিহাসিক ৬ দফা' দাবি পেশ করেন। এটি বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের দলিল অর্থাৎ মুক্তির সনদ হিসেবে পরবর্তীতে আখ্যায়িত হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, কৌশলগত দিক থেকে তিনি ছয়

দফায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ এবং দুই প্রদেশের বৈষম্যের সমাধানের দিকটি প্রাধান্য দেন। একই ধারায় ছয় দফার উপর প্রথম যে প্রচারপত্রটি প্রকাশিত হয় তার শিরোনামও ছিলো 'আমাদের বাঁচার দাবি : ৬-দফা কর্মসূচি'। লাহোর প্রস্তাবের সাথে মিল রেখে ১৯৬৬ সালে ২৩ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে পুলিশের গুলিতে বিভিন্ন স্থানে ১১ জন বাঙালি শহিদ হন। এজন্য প্রতি বছর ৭ জুন বাংলাদেশে '৬ দফা দিবস' পালন করা হয়। বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত '৬ দফা' উপস্থাপন এবং সেই লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতির নেতৃত্ব কাঠামোর চূড়ায় পৌঁছে যান। ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ৪৬ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

৬ দফা কর্মসূচি

দফা ১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন। সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

দফা ২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এ দুটি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

দফা ৩ : দু'টি প্রদেশে পৃথক বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা মুদ্রা একটি থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা থাকবে।

দফা ৪ : প্রদেশগুলোর কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা ৫ : দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়াও আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা ৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রে প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

অর্থাৎ, ৬ দফার মূল বক্তব্য ছিল শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে, অন্য সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে।

ছয় দফা বাংলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়। ১৯৬৬ সালে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার পরই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন তাঁর মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত

হয়। অভূতপূর্ব হরতাল বানচালের জন্য মুক্তিকামী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মিছিলে শাসকগোষ্ঠী গুলি চালায় এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে। শুরু হলো আন্দোলন, ঝরতে থাকল রক্তপাত। আন্দোলনকে রুদ্ধ করার জন্য নতুন করে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হলো। শেখ মুজিবকে জেলে রেখে ১৯৬৮ সালে ৩ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক-অসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই মামলায় এক নম্বর আসামি করা হয় জেলখানায় আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে। যে মামলাটি পরবর্তীতে তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই মামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার জনগণ, বিশেষ করে বাংলার ছাত্রসমাজ। শুরু হয় তীব্র আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১ জানুয়ারি তৎকালীন ডাকসু সহ-সভাপতি ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমদ ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি। ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামির নিঃশর্ত মুক্তির আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠে ঢাকা শহর। চারদিকে প্রতিবাদ, মিছিল ও স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। ১৯ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

এদিকে পাকিস্তান সরকার ঢাকা সেনানিবাসে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারকে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে আসামিদের বিচার কাজ শুরু করে।

১৪

২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আসাদ। মিছিল হয় আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে। ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রুস্তম আলি, মকবুল আর মতিউর। মতিউরের লাশ নিয়ে আয়োজন করা হয় শোক মিছিল। মৃত্যুর শোক তখন শক্তিতে পরিণত হয়। এর মধ্য দিয়ে ঢাকায় সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২৪ জানুয়ারি অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়।

১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যা করা হয় ড. শামসুজ্জোহাকে। ড. জোহার মৃত্যু চলমান গণ-অভ্যুত্থানকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই গণ-অভ্যুত্থানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটায় ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খান দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক শাসন জারি করেন এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং কারামুক্তির পর কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পাশে আছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও পুত্র শেখ কামাল (১৯৬৯)।

১৫

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ১৬৭টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

জাতীয় সংসদের সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভের সুবাদে বঙ্গবন্ধু হন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের পর বিজয়ী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও তা স্থগিত ঘোষণা করা হলে বাংলার মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৬

১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে উৎফুল্ল নেতা-কর্মী ও জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ পূর্ণ হরতাল হলো। এই দিনই ইতিহাসের বৃহত্তম ছাত্র সভায় বার বার 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগানে মুখরিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। চলতে থাকে লাগাতার হরতাল কর্মসূচি। ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন জনসভায় স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৭ মার্চ বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা দেয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন ১৯৭১ সালের এই ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল জনসমুদ্র। সবাই এসেছে। সারা দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। সবাই চিন্তিত। কি নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু আজ। মুহুর্মুহু গর্জনে আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত হচ্ছে। স্লোগান আর স্লোগান। বিকাল তিনটা। মঞ্চে এলেন বাংলার মহান নেতা। ১৮ মিনিটের বক্তৃতা লাখো জনতা শুনলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তারপর থেকেই শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। রাতেই সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানে এবং বন্দি করে রাখে, দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাঁকে হত্যা করার পাঁয়তারা চালায়।

১৭

শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। স্বাধীনতা ও বিজয় পূর্ণতা পায় তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে। সে দিনও তিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আবেগঘন বক্তৃতা করেন, ভবিষ্যতের দেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ ছিল ২৪ বছরের শোষণ, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে, যার সমাপ্তি ঘটে ৩০ লাখ শহিদের প্রাণ ও দুই লাখ মা-বোনের নির্যাতনের শিকার হওয়ার বিনিময়ে।

১৮

বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তরুণ বয়সে তিনি যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে যে এক নতুন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে তা বুঝতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই তাঁর বাঙালি চেতনা শানিত হতে থাকে। তাই তো তিনি ধাপে ধাপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিপ্লবী মতাদর্শ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাঙালি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, জওহরলাল নেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনসহ

বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চিন্তাগত প্রতিফলন তাঁর মনোজগতে ঘটলেও তিনি নিজের মতো করে মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক,বাঙালি জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার আদর্শ ও দর্শন দাঁড় করান। ৭ মার্চের ভাষণে-'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না' তাঁর বাঙালি চেতনার ক্ষুরধার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও মানবকেন্দ্রিক চিন্তার কিছু প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-গ্রন্থে 'ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না' (পৃঃ ২৫৮)। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তা এবং নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রায়োগিক রূপ আমরা দেখতে পাই।

ছাত্রজীবনেই তিনি রাজনীতিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন বলে প্রতীয়মান হয়। দেশবিভাগের সময়ে কলকাতার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পাকিস্তানি-পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদেরকে ব্রিটিশদের মতোই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে দেখছে এবং যে-কোনো উপায়ে দমনপীড়ন করতে চাচ্ছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু অনুভব করতে লাগলেন যে, দুই প্রদেশের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক, জীবনযাপন এবং ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। উপরন্তু, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই পার্থক্য কাটিয়ে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো চেষ্টা তো দূরের কথা, তারা উলটো কর্তৃত্ব ও শোষণ-নিপীড়নের পথই বেছে নিয়েছিল।

তিনি ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনা বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ভাষা অন্দোলন, বাঙালির স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টে অংশগ্রহণ ও ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে বিজয় এবং অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্ব উপরে উল্লিখিত আদর্শে বিকশিত হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে তাঁর ৬ দফার পর তিনি জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্রুত এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে যান যে, দেশে তো বটেই বিশ্ব পরিমণ্ডলেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বাঙালির মুখপাত্র ও শীর্ষ নেতা হিসেবে। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে যখন তিনি দেশে ফিরে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ গড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি শোষিত ও মুক্তিকামী মানুষের নেতা হিসেবে বিশ্বনন্দিত।

১৯

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানের কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু তার নামে চলছিল মুক্তিযুদ্ধ। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার উৎস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। লন্ডন হয়ে তিনি দেশে ফিরেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। এই মহান নেতা ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলে তাঁকে লক্ষ লক্ষ মানুষ একনজর দেখার জন্য ভিড় করে। উৎফুল্ল জনতার একাংশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে "জুলিও-ক্যুরি" শান্তি পদক প্রদানের ঘোষণা দেয় এবং ১৯৭৩ সালের ২৩ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে পদকটি তাঁকে প্রদান করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন, যা ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

১৯৭২ সালে ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের শপথ বাক্য পাঠ করছেন।

২০

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে ঢেলে সাজান তিনি। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল- দুর্নীতিদমন; সাম্যতার ভিত্তিতে জাতির এগিয়ে চলা, ক্ষেতখামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধু মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পান। অবস্থার পরিবর্তন হওয়াও শুরু হয়, কিন্তু সে পরিবর্তন বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

পিতা-মাতার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২১

বঙ্গবন্ধুর সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রদর্শনের রূপ দেখতে পাই তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ১১ মাসে প্রণীত আমাদের সংবিধানে। চারটি মূলনীতি সংবিধানে গ্রহণ করা হয় যথা: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। তা ছাড়া, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার দেখতে পাই যে, এদেশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হবে, সকল নাগরিক সম মানবাধিকার ভোগ করবেন এবং মানব মর্যাদায় বসবাস করবেন। বিশ্বের অন্যান্য নন্দিত জননেতাদের কর্মকাণ্ড তাঁকে উৎসাহিত করে থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে তাঁর সমাজ, মানব ও রাজনৈতিক দর্শন এবং এর প্রায়োগিক দিকগুলোর দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করেন। তিনি ৭ মার্চের ভাষণে বলেছেন, 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' আজকাল গণতন্ত্রের যে দিকটি সবচেয়ে সমালোচিত তা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায্য-অন্যায্য মতামত প্রতিষ্ঠা করাকে প্রাধান্য দেয়া। এই থেকেই জন-অসন্তুষ্টি এবং সমাজে বিভেদ-হানাহানি বাড়তে থাকে। বঙ্গবন্ধু তাই অনেক আগেই অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ধারণা দিয়েছিলেন। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ সমাজতন্ত্রকে নিজস্ব ধারণায় ও আঙ্গিকে গ্রহণ করেন। প্রায় প্রতিটি ভাষণে তিনি গরিব-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা বলতেন। ৭ মার্চের ভাষণেও অসহযোগের কথা বলতে গিয়ে তিনি ঘোষণা দেন 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে... রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে...।' সংবিধানে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিতে তাঁর 'গরিব' মানুষদের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। সম্পদের পুঞ্জিভবনের বিরুদ্ধে এবং সাম্যের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ছিল।

লক্ষণীয়, সংবিধানের মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তার চিরায়ত দিকগুলো গ্রহণ করেন। যে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দুই অংশ এক হয়েছিল, অচিরেই ধরা পড়ে মুসলমান হলেও বাঙালিরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে আলাদা এবং তাদের সঙ্গে এক দেশে থাকা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পর জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলেই বাংলাদেশের সমান নাগরিক, প্রজাতন্ত্রের সম-মালিক হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে গৃহীত জাতীয়তাবাদ এই দর্শনকেই ধারণ করে।

সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বামে ঃ স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা, কোলে সর্বকনিষ্ঠ ছেলে শেখ রাসেল তারপর শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে ঃ শেখ রেহানা এবং শেখ কামাল (১৯৭২ সাল)

২২

দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধুর মানসপটে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলার একটি চিত্র আঁকা ছিল বলে ধারণা করা যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও অন্যান্য আইন প্রণয়ন ছিল এর প্রথম ধাপ। এর পর ধারাবাহিকভাবে নিজের দর্শন মোতাবেক তিনি শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রশাসনিক সংস্কারসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড হাতে নেন।

শিক্ষা ব্যতীত একটি জাতি যে বেশিদূর এগোতে পারে না একথা তাঁর ধারণায় গভীরভাবে উপস্থিত ছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ জয়ী ভঙ্গুর এই জাতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় স্বাবলম্বী করতে তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যার দায়িত্ব ছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা এবং একটি সুষম উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। এছাড়া, তিনি প্রায় ২৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয়করণ করেন।

কৃষিখাত পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলে দায়ের করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়। একই সঙ্গে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির উপর খাজনা এবং বকেয়া খাজনার উপর সুদ মওকুফ করা হয়, পরিবার প্রতি সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করা হয় এবং কোনো একক ধনী কৃষককে গুরুত্ব না দিয়ে সকল কৃষককে সম-সুযোগ দেয়া ও তাদের কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফসল তোলার পর কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান সেই লক্ষ্যে ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়। বঙ্গবন্ধু কৃষকদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে সারাদেশে কম মূল্যে হাজার হাজার বিদ্যুৎ চালিত লো-লিফট পাম্প এবং অনেক গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেন।

বঙ্গবন্ধু মানব সক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। মানুষের সামর্থ্য বাড়ালে দেশ এগিয়ে যাবে- এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। সে জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশের মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ নেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে হলে গাড়ির চাকা সবার আগে ঘুরাতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে মানুষের চলাচল এবং পণ্য পরিবহনের সুব্যবস্থা। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছোটো-বড় ব্রিজ ও রাস্তাঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্ভাব্য অল্প সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করার কাজে হাত দেন বঙ্গবন্ধু। ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজ, সেতু, কালভার্ট, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা ছাড়াও নতুন করে বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও সেতু নির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেদিকে নজর দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে চেয়েছিলেন শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে। তাঁর জীবনদর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সকল বঞ্চনা থেকে গণমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা। তাঁর উন্নয়ন ভাবনা ছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর ছিল আত্মার টান। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষকরাই সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তিমূল কারিগর। তিনি বলেছিলেন "আমাদের চাষিরা সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটলে এ জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়।" তাঁর শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল কৃষি ও কৃষক এবং কৃষি শ্রমিক। যেহেতু সে সময় কৃষিই ছিল অর্থনীতির অধিকাংশ এবং কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ছিল জনসংখ্যার অধিকাংশ, তাই সেখান থেকে শুরু করাই ছিল বাস্তবসম্মত।

পাশাপাশি শিল্পখাতের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সব বড় শিল্পের মধ্যে পাট, চিনি ও বস্ত্র এবং সব বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক-বিমা) জাতীয়করণ করা হয়। অন্যান্য বড় শিল্প ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনা হয়। এগুলোর অধিকাংশ পাকিস্তানিদের মালিকানায় ছিল। পাকিস্তানি মালিকগণ এবং দক্ষ জ্যেষ্ঠ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপকগণ চলে গেলে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানে চলতি মূলধন ও কাঁচামাল ছিল না। এগুলো তো বটেই পাশাপাশি বাঙালি মালিকানায় এসব খাতের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয়করণ করা হয়। আর তা করা হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতাহারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও প্রস্তাব অনুযায়ী। ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী একটি ধনিকশ্রেণি যাতে সৃষ্টি না হয় এবং শিল্প বিকাশের সুফল এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকসহ সকলে এবং বৃহত্তর সমাজ যাতে পেতে পারে সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে বলে তিনি ব্যক্তিমালিকানায় কুটির, অতি ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর জোর দেন। এই ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পরিবেশ মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির চূড়ান্ত ভিত– এই বিষয়টি উপলব্ধিতে রেখে তিনি সারা দেশে গাছ লাগানোর জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। উপকূলীয় বনায়নেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ থেকে উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্বোধন করে বক্তৃতায় বৃক্ষরোপণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ছাড়াও তিনি বলেন 'সুন্দরবন বাঁচাতে না পারলে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না।' সুন্দরবন সুরক্ষায়ও তাঁর নজর ছিল। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শেলা নদী দিয়ে ভারী জাহাজ চলাচলের কারণে সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা বুঝতে পেরে তিনি সাড়ে ছয় কিলোমিটার নদী খনন করিয়ে ভারী নৌযান চলাচলের জন্য ঘষিয়াখালী থেকে মংলা পর্যন্ত বিকল্প নৌপথ স্থাপন করেন। এর অনেক জায়গায় পলিমাটি জমা হয়ে নৌপথটি ২০১০ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রয়োজনীয় নদী খনন করে ২০১৬ সালে তা আবার খুলে দেয়া হয়।

তিনি আঞ্চলিক নদী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জন্য উপকারী হতে পারে এমনভাবে আঞ্চলিক নদীসমূহের উন্নয়ন ও

ব্যবস্থাপনায় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ তৈরি করার জন্য Joint Rivers Commission (JRC) গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যৌথ উদ্যোগে। হাওর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে তিনি 'হাওর উন্নয়ন বোর্ড' গঠনের নির্দেশ দেন। আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থা ও সালিশির মাধ্যমে আমরা যে সমুদ্র বিজয় অর্জন করেছি ২০১২ সালে (মায়ানমারের সঙ্গে) এবং ২০১৪ সালে (ভারতের সঙ্গে) তারও ভিত্তি তিনি সৃষ্টি করে দিয়ে যান 'Territorial Waters and Maritime Zones Act, ১৯৭৪' প্রণয়ন করে।

সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে আর্থসামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বহুমুখী সমবায় দর্শন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এক ভাষণে তিনি বলেন, 'গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সেই চাষ করবে। কিন্তু ভাগ হবে তিন ভাগে- কৃষক, সমবায় ও সরকার।' কৃষকের জমি নিয়ে নেয়ার কথা তিনি বলেননি- যৌথ চাষের কথা বলেছেন। প্রত্যেকটি গ্রাম একেকটি সমবায়ের আওতায় আনার চিন্তা তিনি করেছিলেন। গ্রাম তহবিলের কথাও তাঁর ভাবনায় ছিল, যা চলবে গ্রামে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ এবং সরকারি বরাদ্দ সমন্বয়ে। শুধু গ্রাম নয়, শহরেও সমবায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছিল তাঁর। অর্থাৎ দেশের পুরো আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সকলের ন্যায্য অন্তর্ভুক্তিতে সমবায়ভিত্তিক করার ভাবনা তাঁর ছিল। কিন্তু এই যুগান্তকারী চিন্তা তিনি বাস্তবে রূপ দেয়ার সময় পাননি। এই সমবায় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে দেশ অনেক আগেই অনেক এগিয়ে যেত এবং তা হতো সাম্যভিত্তিক।

২৩

আগেই বলা হয়েছে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাঁর ভাষায় "স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবো না, যদি না আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে ব্যর্থ হই।" স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখেই তিনি বলেছিলেন "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি না এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।" লক্ষণীয়, সাধারণ খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার মূলে ছিল মানুষ,

মানুষের উন্নয়ন, মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। এভাবেই তিনি জনকল্যাণ ধর্মী সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন।

২৪

পাকিস্তানিদের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে এবং বাঙালির অধিকার, সুরক্ষা, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনে তিনি সুদীর্ঘ সংগ্রাম করেন। এই সংগ্রামের পথ-পরিক্রমায় তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন। মানুষকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমাজ ও রাজনৈতিক ভাবনা ও কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। মানুষের সব অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিতকরণে তাঁর আদর্শ আজ বিশ্বেও সকল সুস্থ-চিন্তার মানুষের কাছে নন্দিত। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতা থেকে এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে দারিদ্র্য ও নানা বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণে ক্ষমতাবান করে তুলতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু চলে গেছেন অনেকদিন হলো। এত বছর পরেও বঙ্গবন্ধু নিবিড়ভাবে প্রাসঙ্গিক, বাংলার মাটি এবং আকাশে-বাতাসে মিশে আছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই মহামানবের মহাকীর্তি স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল ভাস্বর থাকবে।

তথ্যসূত্র

- শেখ মুজিবুর রহমান, ***অসমাপ্ত আত্মজীবনী***, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুন ২০১২
- ড. জিল্লুর রহমান খান, ***বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম***, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪
- আমীরুল ইসলাম, ***বঙ্গবন্ধু কিশোর জীবনী: আমাদের বঙ্গবন্ধু***, অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
- কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ***'বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন, ভাবনা ও পদক্ষেপ', মুজিববর্ষ সুবর্ণ অহংকার***, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১
- বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইট

পাদটিকা

- ১,২ ও ৩ : মুজিব শতবর্ষ বিষয়ক ওয়েবসাইট।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২০২১ সাল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পিকেএসএফ-এর প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯৯১ সালে) এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। দেশের শীর্ষ এ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর একজন শীর্ষ নির্বাহী হিসাবে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সাথে নিবিড়ভাবে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এ সকল অভিজ্ঞতা তাঁকে আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, মানব-সম্পদ উন্নয়ন, এডভোকেসি, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে পারঙ্গম করে তুলেছে। তাঁর উদ্যমী এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে পিকেএসএফ অনেকগুলো দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি), মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (প্রাইম), অতি দরিদ্রের জন্য উপযুক্ত ঋণ সহায়তাসহ অনেকগুলো উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

মোঃ জসীম উদ্দিন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'মস্কো ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, মস্কো (বর্তমানে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্ট) হতে ১৯৯০ সালে অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে 'পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি, মস্কো' হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয় ভূমিকায় নানাবিধ প্রশিক্ষণ কর্মশালা, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পারসনেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি'র একজন আজীবন সদস্য এবং 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ' (আইইবি)-এর একজন সাধারণ সদস্য। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন দারিদ্র্যবিমোচন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হতে বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি মানবকল্যাণে কাজ করতে ভালোবাসেন।